ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির প্রাথমিক প্রতিবেদন

ঢাকার শিলালিপি

পৃষ্ঠপোষক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
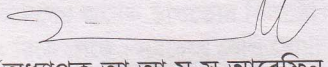
২৭ আগস্ট ২০১০

শুভেচ্ছা বাণী

ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি গত দু'বছর ধরে ঢাকার প্রাচীন স্থাপত্য বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে, তা প্রশংসনীয়। কমিটির খুঁজে পাওয়া অগ্রন্থিত শিলালিপিগুলো ঢাকার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হবে। ভূমিকা রাখবে ঢাকার ইতিহাস সংরক্ষণে।

ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির উদ্যোগে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে পরিচালিত ঢাকার স্থাপত্য গ্রন্থিত করার কাজে ইতিহাসবিদ, অনুবাদক, চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি, কবি, আলোকচিত্রী, সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ একটি অনন্য ইতিবাচক দৃষ্টান্ত।

বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস চর্চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌবরজনক ভূমিকা রয়েছে। বাংলার প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ক মূল্যবান আকর গ্রন্থ 'বাংলাদেশের ইতিহাস' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রণীত হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন সময়ে ঢাকা ও বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার কাজে সহায়তা দিয়ে এসেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অতীতের মতোই ঢাকার স্থাপত্য গ্রন্থিত করার কাজে ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটিকে সহায়তা দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। আমি শিলালিপি বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নসহ কমিটির সকল কাজের সফল পরিসমাপ্তি কামনা করি।

(অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক)
প্রধান উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক
এবং
উপাচার্য,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
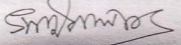
শুভেচ্ছা বাণী

ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি ঢাকার শিলালিপি বিষয়ে প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে জেনে আনন্দিত হয়েছি। গত দু'বছর ধরে কমিটির উদ্যোগে পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে নতুন শিলালিপির সন্ধান লাভ ঢাকার প্রাচীন ইতিহাস চর্চায় এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। জরিপ চালিয়ে পাওয়া অগ্রন্থিত শিলালিপিগুলো ঢাকার ইতিহাস রচনার জন্য নতুন নুতন উপাদান যুক্ত করতে পারে। প্রাচীন ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান শিলালিপি সন্ধানসহ ঢাকার স্থাপত্য গ্রন্থিত করার কাজে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ সব সময়ই তৎপর। প্রতিষ্ঠানটি এই ক্ষেত্রে অন্যান্য যারা উদ্যোগী তাদেরকেও সহযোগিতা দিয়ে থাকে। আমি কমিটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

(অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম)
উপদেষ্টা
এবং
সভাপতি
এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

শুভেচ্ছা বাণী

ঢাকা শহরে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদিতে অসংখ্য শিলালেখ আজও অনাবিষ্কৃত ও এর ফলে অপ্রকাশিত আছে। সেগুলি আবিষ্কার ও অনুবাদের মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন তরুণ শিক্ষার্থী যারা ইতিমধ্যে শিক্ষাজীবন শেষ করেছেন অথবা শেষ করার পথে, তারা এ কাজটা করার জন্য বেশ উৎসাহের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছেন এবং তাদের সহযোগিতা দিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকও। তারা এ ব্যাপারে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন দেখে আমার আনন্দের অবধি নেই। আমি তাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

(আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া)
উপদেষ্টা
এবং
অনুবাদক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ
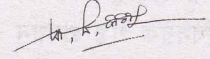
শুভেচ্ছা বাণী

ইতিহাস ও ঐতিহ্য জাতিকে চলার প্রেরণা যোগায়। সে কারণে ঐতিহ্যের নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ অবশ্যই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এ ধরনের উদ্যোগ অতীতে বিশেষজ্ঞদেরই ছিল। তরুণ-তরুণীরা সংঘবদ্ধ হয়ে এ ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছে, তা তাদের নতুন চেতনারই প্রকাশ। এ চেতনা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। তাদের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আমি আশা করবো, তাদের এ উদ্যোগ কেবল লিপি অনুসন্ধানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বিস্তার লাভ করবে অন্যান্য ঐতিহ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ উদ্যোগেও। এ বিস্তারের বহু মাত্রা রয়েছে। স্থাপত্য ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদিও সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

সংগৃহীত নিদর্শন অতি দ্রুত প্রকাশ করাও একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে চুরি করে অন্য কেউ প্রকাশ করবে, তা খুবই স্বাভাবিক। বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে আমরা একটু নৈতিকতা কি আশা করতে পারি না?

প্রশংসনীয় এ উদ্যোগের প্রতি রইল আমার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি।

(অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরী)
উপদেষ্টা
এবং
অধ্যাপক,
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
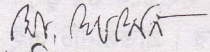
শুভেচ্ছা বাণী

আমি আনন্দিত যে ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি ঢাকার শিলালিপি শীর্ষক গ্রন্থের একটি প্রতিবেদন আগামী ২৭ আগস্ট ২০১০ এ প্রকাশ করতে যাচ্ছে। আমি এজন্য কমিটি এবং এর গবেষকদের অভিনন্দন জানাই।

বাংলার ইতিহাসের সাহিত্যিক উৎসের স্বল্পতায় আমরা সাধারণভাবে মধ্যযুগীয় শাসনের লিপি-তথ্য খুঁজে বেড়াই। এই প্রেক্ষোপটে সুলতানী বাংলার প্রচুর শিলালিপি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে ইতিহাসের শূন্যতা অনেকাংশে কমে এসেছে। কিন্তু মুঘল আমলের বেলায় তা হয়নি। কারণ অনেক। এই শূন্যতা পূরণ করতে আমাদের নতুন প্রজন্মের গবেষকরা এগিয়ে এসেছেন তাতে উৎসাহিত ও আশান্বিত বোধ করছি। তাদের একনিষ্ঠ আগ্রহ ও চিন্তা-চেতনায় আমাদের ইতিহাস স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হবে এ বিশ্বাস অবশ্যই রাখতে পারি। একটি অধ্যায়ের প্রকাশনা অন্য অধ্যায়ের দিক নির্দেশক হবে এটি ইতিহাসের পদ্ধতি। কমিটি ও গবেষকরা তাদের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবেন এই কামনা করছি।

(এবিএম হোসেন)
উপদেষ্টা
এবং
অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
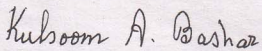
শুভেচ্ছা বাণী

যে জাতির অতীত ঐতিহ্য যতটা দীর্ঘ সভ্যতায় সে জাতি ততটাই সমৃদ্ধ। বর্তমান বাংলাদেশ তথা বৃহৎ বাংলার ইতিহাস সুদীর্ঘ। প্রাচীনকালের বঙ্গই বর্তমান বাংলাদেশ। এ অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই সভ্যতার অস্তিত্ব ইতিহাসে স্বীকৃত। প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলের নৌবন্দরগুলো যেমন বিশ্বসভ্যতা বিনির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে তেমনি বহু প্রাচীন স্থাপত্য কালের নিদর্শন হিসেবে আজও সগর্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

যুগের বিবর্তনে এ অঞ্চলে মুসলিম শাসনের যে গোড়াপত্তন ঘটেছিল তার বেশিরভাগ সময়জুড়েই শাসন করেছে মুঘল-তুর্কীয় পারস্য বংশোদ্ভূতরা। মূলতঃ সে সময়ই বাংলার সভ্যতা, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, ভাষা, সাহিত্য সবচেয়ে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। উল্লেখ্য,এই দীর্ঘ সময়কালে এ অঞ্চলে ফারসি ছিল রাজ-ভাষা, প্রশাসন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার ভাষা। তাই বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্যে ফারসি এবং পারস্য সংস্কৃতির প্রভাব সর্বত্রই লক্ষণীয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমানে ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির উদ্যোগে ঢাকার প্রাচীনকাল থেকে মুঘল আমল পর্যন্ত স্থাপত্য গ্রন্থিত করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার মাধ্যমে আমাদের সেই অতীত ঐতিহ্য বিস্মৃতি থেকে রক্ষা পাবে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের গৌরবময় উজ্জ্বল ঐতিহ্যের পরিচয় নতুন করে উঠে আসবে। তাদের এই মহৎ প্রয়াসকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই প্রচেষ্টার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

Kulsoom A. Bashar
(ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার)
উপদেষ্টা
এবং
অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রাজধানী ঢাকার প্রাচীন স্থাপত্য বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ২০০৮ সালের ২২ আগস্ট গঠিত হয় স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি। শুরুতে উদ্দেশ্য ছিল রাজধানী ঢাকায় যেসব প্রাচীন স্থাপনা এখনও টিকে আছে, সেগুলো চিহ্নিত করে সেসব নিয়ে কাজ করা। স্থাপনার অগ্রন্থিত শিলালিপির অনুবাদ, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, চিত্রকর্ম, আলোকচিত্র, স্থাপত্য নকশা তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে আমরা অগ্রসর হই। কমিটি গঠনের পর প্রাথমিক কাজ হিসেবে ঢাকার প্রাচীন স্থাপত্য সম্পর্কে জরিপ চালানো শুরু হয়, অগ্রন্থিত শিলালিপির খোঁজ শুরু হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে শিলালিপি জরিপসহ প্রাচীন স্থাপনা গ্রন্থিত হওয়ার কাজটি স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। জরিপ কাজে অংশ নিচ্ছেন আলোকচিত্রী, ইতিহাসবিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ, গবেষক, স্থপতি, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশার বিশেষজ্ঞ।

ছোট কাটরা, সাত গম্বুজ মসজিদ, করতলব খান মসজিদসহ ঢাকার মুঘল আমলের অনেক স্থাপত্যের শিলালিপি বর্তমানে নেই। ছিল, কোনো এক সময় হারিয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি খোয়া গেছে ভেঙ্গে ফেলা স্থাপত্যের শিলালিপি। আবার ঢাকার মুঘল আমলের অনেক মসজিদে শিলালিপি আছে। কিন্তু এখনো গ্রন্থিত হয়নি।

রাজধানী ঢাকার শিলালিপি খুঁজে পাওয়া ও গ্রন্থভুক্ত হওয়া শুরু হয় উনিশ শতকের শেষার্ধে। আমাদের জরিপ কাজ শুরু হওয়ার আগে প্রাচীন কাল থেকে মুঘল আমল পর্যন্ত রাজধানী ঢাকার ১৭টি স্থাপনার মোট ২১টি শিলালিপি গ্রন্থিত হয়েছে। এর মধ্যে ৪টি স্থাপনার দু'টি করে শিলালিপি রয়েছে। গ্রন্থিত শিলালিপিগুলোর মধ্যে একটি সংস্কৃত, একটি আরবি ও ১৯টি ফারসি ভাষার। প্রথম গ্রন্থনা ১৮৭২ সালে। জেমস ওয়াইজের খুঁজে পাওয়া নাসওয়ালা গলি মসজিদের আরবি ভাষার শিলালিপি ওই বছর প্রথম ছাপেন ব্লকমান (জেএএসবি, ভল্যুম-৪১)।

আর ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের 'লালবাগ দুর্গ ও জাদুঘর' শীর্ষক পুস্তিকায় প্রকাশিত লালবাগ মসজিদের দুটি শিলালিপির অনুবাদ সর্বশেষ নতুন শিলালিপি গ্রন্থনার উদাহরণ।

সব মিলিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির ৪টি জার্নালে ৪টি স্থাপনার ৪টি, ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের দুটি রিপোর্টে দুটি স্থাপনার ৩টি, সৈয়দ আওলাদ হাসানের এন্টিকুইটিস অব ঢাকা বইতে ১০ স্থাপনার ১১টি, মুনশী রহমান আলী তায়েশের তাওয়ারীখে ঢাকা বইতে একটি স্থাপনার একটি ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের পুস্তিকায় একটি স্থাপনার ২টি শিলালিপি পাওয়া যায়। নাসওয়ালা গলি মসজিদের পর ঢাকার দ্বিতীয় গ্রন্থিত শিলালিপিও ব্লকমানের। শাহ আলী মসজিদের ওই শিলালিপি ছাপা হয় ১৮৭৫ সালে (জেএএসবি, ভল্যুম-৪৪)। তৃতীয় শিলালিপি গ্রন্থণার কৃতিত্ব আলেকজান্ডার কানিংহামের। ১৮৭৯-৮০ সালে প্রকাশিত তার আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া রিপোর্টে পরীবিবির সমাধির দুটি শিলালিপি ছাপা হয়।

প্রথম শিলালিপি গ্রন্থিত হওয়ার ৮৮ বছর পর ১৯৬০ সালে প্রথমবাবের মতো শিলালিপি সমগ্র প্রকাশিত হয়। শামসুদ্দিন আহমেদের ইনসক্রিপশনস অব বেঙ্গল-(৪) নামে ওই বইতে পূর্বে গ্রন্থিত পাঁচটি শিলালিপি ছাপা হয়। অবশ্য তার আগে ১৯০৩ সালে সৈয়দ আওলাদ হাসানের স্থাপত্য গ্রন্থ 'এন্টিকুইটিস অব ঢাকা'তে নতুন ১০টি স্থাপনার ১১টি ও মুনশী রহমান আলী তায়েশের মৃত্যুর (১৯০৮) পর প্রকাশিত তার স্থাপত্য গ্রন্থ 'তাওয়ারীখে ঢাকা'তে নতুন একটি স্থাপনার একটি শিলালিপি ছাপা হয়।

এন্টিকুইটিস অব ঢাকা বইতে ছাপা হওয়া নতুন শিলালিপিগুলো হলো- বিনত বিবির মসজিদ, বড় কাটরা, চক মসজিদ, হোসেনী দালান, ঈদগাহ, শায়েস্তা খাঁর মসজিদ, চুড়িহাট্টা মসজিদ, খাজা শাহবাজ মসজিদ, খাজা আম্বর মসজিদ ও খান মোহাম্মদ মৃধার মসজিদের শিলালিপি।

তাওয়ারীখে ঢাকা বইতে নতুন পাওয়া যায় আজিমপুর কবরস্থান মসজিদের শিলালিপি।

১৯১১ সালে আরডি ব্যানার্জির খুঁজে পাওয়া লক্ষ্মণ সেনের আমলের চণ্ডী দেবীর সংস্কৃত ভাষার শিলালিপি ছাপা হয় ১৯১৩ সালে (এনএস, জেএএসবি, ভল্যুম-৯)।

১৯২৭-২৮ সালে প্রকাশিত আরপি চন্দের ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রথম ছাপা হয় হেকিম হাবিবুর রহমানের খুঁজে পাওয়া চকের শিলালিপি।

আওলাদ হাসানের বইতে খান মোহাম্মদ মৃধার মসজিদের প্রথম শিলালিপি ছাপা হওয়ার ৬৪ বছর পর অধ্যাপক আব্দুল করিমের উদ্যোগে ১৯৬৭ সালে ওই মসজিদের দ্বিতীয় শিলালিপি ছাপা হয় (জেএএসপি, ভল্যুম-১১, ২)।

১৯৭৪ সালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের 'লালবাগ দুর্গ ও জাদুঘর' শীর্ষক পুস্তিকায় ছাপা হয় লালবাগ কিল্লা মসজিদের দু'টি শিলালিপি। এরপর গত ৩৬ বছরে আর কোনো নতুন শিলালিপি গ্রন্থণার নজির নেই। তবে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত আব্দুল করিমের কর্পাস অব দ্য অ্যারাবিক অ্যান্ড পারসিয়ান ইনসক্রিপশনস অব বেঙ্গল বইতে পূর্বে গ্রন্থিত ১৫ স্থাপনার ১৭টি শিলালিপি ছাপা হয়।

ঢাকার বিভিন্ন প্রাচীন শিলালিপি মূলত মসজিদ, মাজার, চার্চ ও কবরস্থানে রয়েছে। প্রাচীনকালের বিভিন্ন মন্দির ও আখড়া জরিপকালে কোনো শিলালিপির সন্ধান আমরা পাইনি। জরিপকালে ঢাকার বিভিন্ন মহল্লা ও গলিতে আমাদের যাতায়াত বাড়ে। মসজিদ, মাজার, চার্চ ও কবরস্থানে গিয়ে শিলালিপির খোঁজ করতে থাকি। কোথাও পাই, আবার কোথাও পাওয়া যায়নি। কোথাও আবার শিলালিপি নেই জেনে ফিরে এসে আবার শিলালিপির সন্ধান পাই। শিলালিপি হারিয়ে গেছে মসজিদ, মাজার আর চার্চের কবরস্থানের।

বুড়িগঙ্গা তীরবর্তী আলমগঞ্জ মসজিদের শিলালিপি নেই বলে সরজমিন জরিপকালে মসজিদ কমিটির নেতারাসহ সংশিষ্টরা জানিয়েছিলেন। আমরাও শিলালিপি নেই মনে করে ফিরে আসি। কিন্তু পরবর্তীকালে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনে প্রাচীন ঢাকার স্থাপত্যের দলিল পর্যবেক্ষণের সময় আলমগঞ্জ মসজিদের শিলালিপির ছবি পাওয়া যায় যায়। ওয়াক্‌ফ প্রশাসন থেকে ছবি নিয়ে গেলে মসজিদের স্টোর থেকে শিলালিপি এনে আমাদের আলোকচিত্র গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়।

বাইতুল হুজ্জাত মসজিদের শিলালিপির ছবি আমরা মসজিদ কমিটি এবং ওয়াক্‌ফ প্রশাসন থেকে পেয়েছিলাম। পার্থক্য হচ্ছে বাইতুল হুজ্জাত মসজিদের কর্তৃপক্ষ শিলালিপিটির আলোকচিত্র গ্রহণের সুযোগ দেবেন বলে দু'বছর ধরে আশ্বাস দিয়ে আসছেন। বার বার চেষ্টা করে আমরা এখনো শিলালিপি দেখতে পাইনি। দেখা সম্ভব হয়নি আলুবাজার জামে মসজিদের শিলালিপি।

জরিপের ফলাফল থেকে দেখা গেছে, ঢাকা থেকে মুঘল রাজধানী স্থানান্তরের পর দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত হয়ে থাকা অঞ্চলগুলোর মসজিদে শিলালিপি নেই। বুড়িগঙ্গা তীরবর্তী আলমগঞ্জ থেকে হাজারীবাগ পর্যন্ত বিগত ৬ শতাধিক বছর ধরে বসতি প্রবাহমান। শিলালিপিগুলো অধিকাংশ ওই প্রবাহমান অঞ্চলে। উল্লেখযোগ্য শিলালিপি রয়েছে ধোলাই নদীর দুই তীরে বংশাল, রায় সাহেববাজার, গেন্ডারিয়া, নারিন্দা ইত্যাদি এলাকায়। ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, রমনা, তেজগাঁও ইত্যাদি অঞ্চলে শিলালিপির সংখ্যা খুব কম। ঢাকার উত্তরাঞ্চলে আমরা এখনো কোনো শিলালিপির সন্ধান পাইনি।

শিলালিপি বিষয়ে অনুসন্ধানকালে প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে, শিলালিপির হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটে সংস্কার ও পরিবর্ধনের সময়। আগের কাঠামো ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণের সময় শিলালিপি রাখা হয় প্রভাবশালী কারো হেফাজতে। তবে স্থাপনা ভেঙে নতুন ভবন তৈরীর পর সেখানে পুরাতন শিলালিপি প্রতিস্থাপনের ঘটনাও বেশ আছে। আদি কাঠামো না থাকলেও রায় সাহেব বাজার পুলের মসজিদ ও চুড়িহাট্টা মসজিদের শিলালিপি নতুন ভবনের গায়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কারাগার বাগানবাড়ি মসজিদ পরিবর্ধনের পর এর শিলালিপিটি ভিতর থেকে খুলে এনে বাইরের দেয়ালে বসানো হয়েছে। বাবুবাজার মসজিদের শিলালিপি রাখা হয়েছে নতুন ভবনের তিনতলায় এক কোণে আলমিরার আড়ালে। আদি কাঠামোর সাথে নতুন কাঠামো সংযোজনের ফলে বুড়িগঙ্গা তীরবর্তী শায়েস্তা খাঁ

মসজিদের শিলালিপি এখন দেখতে হলে মসজিদের ছাদে যেতে হয়।

শিলালিপি চিহ্নিত করার পরই ২০০৮ সাল থেকে শুরু হয় আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ। ৮ জন প্রেস ফটোগ্রাফার আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। তারা হলেন পাভেল রহমান, নাসির আলী মামুন, ফিরোজ চৌধুরী, জিয়া ইসলাম, সৈয়দ জাকির হোসেন, কাকলী প্রধান, শেখ হাসান ও জয়ীতা রায়। শিলালিপির আলোকচিত্র গ্রহণের সময় বিভিন্ন মসজিদ ও মাজার কমিটির নেতা, ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেমসহ সংশ্লিষ্টরা সহায়তা করেছেন। তবে দু'টি শিলালিপির আলোকচিত্র এখনো আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। হযরত শাহ আলীর মাজারের শিলালিপির আলোকচিত্র গ্রহণ করতে গিয়ে কমিটির পক্ষ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হন আলোকচিত্রী কাকলী প্রধান। নারী ফটোগ্রাফার মাজারের ছবি তুলতে পারবে না বলে জানান কমিটির কর্মকর্তারা। কাকলী প্রধান ছাড়া শিলালিপিটির আলোকচিত্র গ্রহণ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কমিটি এ বিষয়ে সংশিষ্টদের সহায়তা কামনা করছে। বঙ্গভবন এলাকায় অবস্থিত প্রাক মুঘল যুগের সুফি সাধক হযরত শাহজালাল দক্ষিণীর মাজারের শিলালিপির আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য আমরা আবেদন করেছি। বিষয়টি এখনো প্রক্রিয়াধীন।

জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত অগ্রন্থিত ফারসি শিলালিপি অনুবাদের কাজ ২০০৯ সালের প্রথমদিকে শুরু হয়। জরিপ চলাকালে আলেমদের দ্বারা অনূদিত ৪টি শিলালিপির অনুবাদ স্থানীয় মসজিদ কমিটি ও ওয়াকফ্ প্রশাসন থেকে সংগ্রহ করি। এগুলো হচ্ছে লক্ষ্মীবাজার মসজিদ, নলগোলা শাহী মসজিদ, চকবাজারের বায়তুল ইজ্জত জামে মসজিদ ও বড় ভাট মসজিদ। এ ৪টি অনুবাদ গ্রন্থভুক্ত করার এবং প্রাপ্ত অন্য সকল শিলালিপি অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ফারসি শিলালিপি অনুবাদ করেন আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, অধ্যাপক কুলসুম আবুল বাশার, ড. গীতি ফারোজ, ড. মুহসীন উদ্দিন মিয়া, ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান, ড. আবদুস সবুর খান, ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী, আনিসুর রহমান স্বপন, কামালউদ্দিন প্রমুখ। ২০০৯ সালের ১০ মে দু'জন ৩টি শিলালিপি অনুবাদ করে কমিটির কাছে পাঠান। ফারসি অনুবাদকদের সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অথবা সাবেক ছাত্র। ২০০৯ সালের আগস্টের মধ্যে ফারসি অনুবাদ বেশ এগিয়ে যায়।

ফারসি শিলালিপি বাংলায় অনুবাদ হওয়ার পর আমরা ইংরেজিতে অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করি। ২০০৯ সাল থেকে শুরু হয় ইংরেজিতে অনুবাদ প্রক্রিয়া। ১০টি শিলালিপির ইংরেজি অনুবাদ এ পর্যন্ত করা হয়েছে। অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিক, অধ্যাপক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, স্থপতি রবিউল হুসাইন, অধ্যাপক ফকরুল আলম, অধ্যাপক ফিরদৌস আজিম, অধ্যাপক কাজল ব্যানার্জি প্রমুখ।

সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ছাড়াও ঢাকায় মুঘল আমলের আর্মেনিয়ান, পর্তুগিজ, লাতিন ও ইংরেজি ভাষার শিলালিপি রয়েছে। মুঘল ঢাকায় ইউরোপীয় ভাষার এসব শিলালিপির যথাযথ গ্রন্থণা এখনো হয়নি। খুঁজে পাওয়া যায়নি এসব শিলালিপির অনুবাদ। ঢাকায় ইউরোপীয় ভাষার শিলালিপিগুলো মূলত সমাধিলিপি। ঢাকার খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের দু'টি প্রাচীন স্থান তেজগাঁও চার্চ ও নারিন্দা খ্রিস্টান কবরস্তানে রয়েছে এসব শিলালিপি। এ দু'টি স্থানে কোম্পানি ও ব্রিটিশ আমলের শিলালিপি রয়েছে। আরমানিটোলার আরমেনিয়ান চার্চে রয়েছে ইউরোপীয় ভাষার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিলালিপি। তবে সেসব শিলালিপি কোম্পানি ও ব্রিটিশ আমলের। কোম্পানি আমলের গ্রীক ভাষার শিলালিপি রয়েছে কয়েকটি স্থানে।

ইউরোপের ভাষার মধ্যে পর্তুগিজ ও লাতিন ভাষার অনুবাদ সহজেই সম্পন্ন হয়ে যায় ইতালির বংশোদ্ভূত ধর্মতত্ত্ববিদ ও অনুবাদক ফাদার সিলভানো গেরেল্লো এবং ব্রাজিল বংশোদ্ভূত ফাদার অগস্তো রামোসের কারণে। ফাদার সিলভানো গেরেল্লো ল্যাটিন এবং ফাদার অগস্তো রামোস পর্তুগিজ শিলালিপি অনুবাদ করেছেন। তবে আর্মেনীয় ভাষার অনুবাদকর্ম এখনো সম্পাদন করা যায়নি। আমরা এ ব্যাপারে দেশে-বিদেশে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

অগ্রন্থিত শিলালিপির অনুবাদ কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ২০০৯ সালেও আমরা শিলালিপির সন্ধান অব্যাহত রাখি। ২০০৮ সালে ২১টি, ২০০৯ সালে ৯টি ও ২০১০ সালে ২৪টি মোট ৫৪টি শিলালিপির সন্ধান পাই। এর মধ্যে একটি আরবি এবং বাকিগুলো ফারসি। নবাবগঞ্জ মসজিদের আরবি ভাষার শিলালিপিটি অনুবাদ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক অধ্যাপক আবু বকর সিদ্দিক।

অনুবাদ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ২০০৯ সালে গঠন করা হয় ৫ সদস্যের ফারসি অনুবাদ সম্পাদনা পরিষদ। তাঁরা হলেন অনুবাদক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কুলসুম আবুল বাশার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর ড. গীতি ফারোজ, নিউজ লেটার পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আবদুস সবুর খান।

২০০৯ সালের ১৬ অক্টোবর ফারসি অনুবাদ সম্পাদনা পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সভায় অনুবাদের মান নির্ধারণ করা হয়। এছাড়াও অনুবাদ চূড়ান্ত করা ৪টি শিলালিপির। এগুলো হচ্ছে কাজী শরীফ মসজিদের শিলালিপি-১, কাজী শরীফ মসজিদ শিলালিপি-২, নলগোলা শাহী মসজিদের শিলালিপি এবং আগা সাদেক রোড মসজিদ এর শিলালিপি। তিন দিন পর ১৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় সভা। এতে আরো ৮টি শিলালিপির অনুবাদ চূড়ান্ত করা হয়। শিলালিপিগুলো হচ্ছে শাহ নূরী মসজিদের শিলালিপি, বিবি মরিয়ম সালেহা মসজিদের শিলালিপি, রায় সাহেববাজার পুলের মসজিদের শিলালিপি, আমলিগোলা ছোট মসজিদের শিলালিপি, হাজী বেগ মসজিদের শিলালিপি, কেন্দ্রীয় কারাগার বাগানবাড়ী জামে মসজিদের শিলালিপি, বড় কাটরা ছোট মসজিদের শিলালিপি ও খাজে দেওয়ান লেন মসজিদের শিলালিপি।

সম্পাদনা পরিষদের ১৯ অক্টোবরের সভার পর অনুবাদের গতি কিছুটা মন্থর হয়ে পড়ে। ২০০৯ সালের ১৫ জানুয়ারি পরবর্তী সভা আহ্বান করা হয়। এ সভায় উপস্থিত হন আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, অধ্যাপক কুলসুম আবুল বাশার ও ড. গীতি ফারোজ। সবাইকে নিয়ে সভা করার লক্ষ্যে ওই দিনের সভা স্থগিত করা হয়। ওই দিনই উপস্থিত সম্পাদকরা বাকিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ২২ জানুয়ারি পরবর্তী সভার তারিখ নির্ধারণ করেন। ২২ জানুয়ারির সভায় আরো ৪টি শিলালিপির অনুবাদ চূড়ান্ত করা হয়। এগুলো হচ্ছে আলমগঞ্জ মসজিদ, নিমতলী ছাতাওয়ালা মসজিদ ও আমলীগোলা বড় মসজিদ। ২২ জানুয়ারির সভায় শিলালিপির ফারসি বর্ণের রীতি নির্ধারণ ও শিলালিপি ফারসি বর্ণে লেখার জন্য সম্পাদনা পরিষদের দু'জন দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। কাজটি এখন প্রক্রিয়াধীন। ২২ জানুয়ারি সভার আগে আরো তিনটি উপ সভা ফারসি বিভাগ এবং অধ্যাপক কুলসুম আবুল বাশারের বাসায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত হন অধ্যাপক কুলসুম আবুল বাশার, ড. গীতি ফারোজ ও ড. আবদুস সবুর খান।

সম্পাদনা পরিষদের তৃতীয় সভার পর একটি সংবাদে আমরা কিছুটা হতবিহ্বল হয়ে পড়ি। খবর পাই, কমিটির উদ্যোগে খুঁজে পাওয়া কিছু শিলালিপি প্রকাশ করা হয়েছে। ফারসি সম্পাদনা পরিষদের কয়েকজন সদস্য তাগিদ দেন একটি ইংরেজি ও একটি আরবি ভাষার বই সংগ্রহের।

বই দু'টি সংগ্রহ করা হয়। একই লেখকের লেখা ইংরেজি ও আরবি গ্রন্থ। লেখক পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষক মোহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক। ইংরেজি বইটির সম্পাদক জাতীয় জাদুঘরের সাবেক মহাপরিচালক ড. এনামুল হক। ঢাকার বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র প্রকাশিত 'হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল আসপেক্টস অব দ্য ইসলামিক ইনসক্রিপশনস অব বেঙ্গল: এ রিফ্লেকটিভ স্টাডি অব সাম নিউ এপিগ্রাফিক ডিসকভারিস' শীর্ষক ইংরেজি ভাষার বইটির প্রকাশকাল নভেম্বর ২০০৯।

বইটিতে ২০০৮ সালে কমিটির খুঁজে পাওয়া ৮টি শিলালিপি প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে গ্রন্থিত সকল শিলালিপির নির্দিষ্ট ঠিকানা ও বিবরণ থাকলেও নতুন কোনো শিলালিপিরই দেওয়া হয়নি বিবরণ। বলা হয়নি নির্দিষ্ট ঠিকানাও। ঠিকানা হিসেবে কেবল 'পুরনো ঢাকা' উল্লেখ করায় সেগুলো কোথায় কিভাবে আছে তা বোঝারও সুযোগ নেই। আবার দু'একটি মসজিদের ঠিকানা দেওয়ার চেষ্টা করলেও মসজিদের প্রকৃত অবস্থানের ধারে-কাছে যেতে পারেননি লেখক। যেমন মিটফোর্ড হাসপাতাল ও চকবাজারের মধ্যবর্তী নলগোলা শাহী মসজিদকে তিনি উল্লেখ করেছেন নবাবগঞ্জের রথখোলার স্থাপনা হিসেবে।

আবার মাজার ঘরের প্রবেশ পথের উপরের দেওয়ালে গাঁথা বাড্ডানগর মুন্সীবাড়ীর মসজিদের শিলালিপিকে তিনি দেখেছেন মসজিদের গায়ে। শিলাখণ্ডের পরিমাপ বলতে গিয়ে সব স্থানেই 'অজানা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন লেখক। এমনকি গ্রন্থিত শিলালিপি কোন রঙের পাথরে তাও বলতে পারেননি তিনি। যেমন- কাজী মোহাম্মদ শরীফ মসজিদের শিলালিপি কোন পাথরের তা বলতে গিয়ে তিনি 'সম্ভবত কালো পাথর' কথাটি ব্যবহার করেছেন। সব স্থাপনার নামও লেখক যথার্থভাবে উল্লেখ করতে পারেননি। কাজী শরীফ মসজিদকে ডিসি রায় মসজিদ ও হাজী বেগ মসজিদকে ঢাকেশ্বরী রোড মসজিদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

শিলালিপি বিষয়ে গবেষণার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ ইউনির্ভাসিটির ফ্যাকাল্টি অব হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ও পাকিস্তানের হায়ার এডুকেশন কমিশন এবং ইরান হেরিটেজ ফাউন্ডেশন লন্ডন থেকে তহবিল পেয়েছেন বলে লেখক তার বইয়ের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। তবে কবে জরিপ চালিয়েছেন, কিভাবে চালিয়েছেন বা কোন কোন জায়গায় নতুন শিলালিপি জরিপে পেয়েছেন তা উল্লেখ করেননি।

বইটিতে আর সব শিলালিপির আলোকচিত্র ছাপা হলেও নতুন শিলালিপিগুলোর ফটোকপি ছাপা হয়েছে। গ্রন্থে আলোকচিত্রের ফটোকপি ছাপানোর ঘটনা বিরল। প্রসঙ্গত, প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে আমরা শিলালিপির আলোকচিত্রের ফটোকপি বিতরণ করেছি।

হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল আসপেক্টস অব দ্য ইসলামিক ইনসক্রিপশনস অব বেঙ্গল: এ রিফ্লেকটিভ স্টাডি অব সাম নিউ এপিগ্রাফিক ডিসকভারিস শীর্ষক বইটিতে প্রকাশিত সব ক'টি নতুন শিলালিপির রেফারেন্স হিসেবে আরবি ভাষায় প্রকাশিত একই লেখকের 'রিহলা মা'আল নাকুশ আল ইসলামিক ফি বানগাল' বইটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আরবি বইটিতেও অন্য সব শিলালিপির আলোকচিত্র প্রকাশ হলেও নতুন শিলালিপির ফটোকপি ছাপা হয়েছে। বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র থেকে আরবি গ্রন্থটি সংগ্রহ করে দেখা গেছে, তাড়াহুড়ো করে ছাপানোর কারণেই কি না কে জানে বইয়ের লেখকের নামের বানান ভুল ছাপা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে এই বইটি নিয়েও বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। শিলালিপি খুঁজে পাওয়ার সত্যতার বিষয়টি নিয়ে আমরা আরো অনুসন্ধান চালাবো এবং পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

এ অবস্থায় কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ মস আরেফিন সিদ্দিক কাজটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দেন। তাগিদ দেন শিলালিপিগুলো প্রকাশের। দেন সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস। শিল্পী শাহাবুদ্দিন, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অনুবাদক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, ইতিহাসবিদ অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরী, অধ্যাপক এবিএম হোসেন, স্থপতি মীর মোবাশ্বের আলী, স্থপতি শামসুল ওয়ারেস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি বিভাগের অধ্যাপক কুলসুম আবুল বাশার প্রমুখ তখন আমাদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন।

২০০৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে আমরা জরিপ কাজ থেকে বিরত থাকি। আমাদের পরিকল্পনা ছিল ২০০৮ ও ২০০৯ সালে প্রাপ্ত অনুবাদ চূড়ান্ত হয়ে গেলে আবার জরিপ চালানোর। একদিকে জরিপে প্রাপ্ত ৯ টি শিলালিপি অন্য লেখকের গ্রন্থে প্রকাশ হয়ে যাওয়া, অন্যদিকে সম্পাদকমণ্ডলীর সভা হতে দেরি হওয়ার ফলে আমাদের আশংকা হয়, ২০০৮ ও ২০০৯ সালে জরিপে প্রাপ্ত বাকী শিলালিপিগুলোও কেউ প্রকাশ করে ফেলতে পারে। এ আশংকা থেকেই দ্রুত শিলালিপি প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। আবার জরিপের উদ্যোগ গ্রহণ করি। উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভার।

২০১০ সালের জুন মাস থেকে কমিটির অন্যান্য কাজের পাশাপাশি আবার জোরদার হয় শিলালিপি খোঁজার তৎপরতা। আবার খোঁজ পেতে শুরু করি অগ্রন্থিত শিলালিপির। এ বছর আগস্ট পর্যন্ত আমরা লালবাগ, কোতয়ালী, সূত্রাপুর, রমনা, ধানমন্ডি, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, তেজগাঁও ইত্যদি এলাকায় জরিপ চালিয়ে ২৪টি অগ্রন্থিত শিলালিপির সন্ধান পেয়েছি। এ বছর খুঁজে পাওয়া ২৪টি শিলালিপি এখনো অনুবাদ না হওয়ায় সময় নির্ধারণ করা যায়নি। ২০১০ সালে খুঁজে পাওয়া অগ্রন্থিত শিলালিপিগুলো হচ্ছে গার্ড সাহেবের মসজিদ, আরমানিয়ান স্ট্রিট মসজিদ, ইসলামপুর জব্বু খানম মসজিদ, রুকনপুর কাজী বাড়ির মসজিদ, লোহার পুল জামে মসজিদ, রুকনপুর জামে মসজিদ, বাবুবাজার মসজিদ, বাশপট্টি মসজিদ (২টি), বেচারাম দেউড়ি মসজিদ, শাহ সৈয়দ কাশ্মিরীর মাজার, আমির উদ্দিন দারোগার মসজিদ (২টি), প্যারিদাস রোড মসজিদ, নূরানী মসজিদ, মালিটোলা মসজিদ, নাজিরা বাজার বড় জামে মসজিদ, শাহ সাহেব বাড়ি মসজিদ (৩টি), কাজী মাসউদ বাগদাদীর মাজার, শাহ সাহেব মাজার, আলী নকি দেউড়ি মসজিদ, বড় দায়রা মসজিদ, বড় দায়রা মাজার (২টি), ছোট দায়রা মসজিদ, নাজিমউদ্দিন রোড শাহী মসজিদ ও ইব্রাহিম আদহামের মাজার।

শুরুতে লক্ষ্য ছিল ঢাকার সবচেয়ে প্রাচীন ১০০টি স্থাপনা নিয়ে আমরা কাজ করবো। অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রাচীনকাল থেকে মুঘল আমল পর্যন্ত স্থাপত্য নিয়ে কাজ করার। এ পর্যায়ে এসে আমরা শিলালিপি বিষয়ে দু'টি গ্রন্থ প্রকাশের লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। প্রাচীন কাল থেকে মুঘল আমল পর্যন্ত ঢাকার আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, লাতিন, পর্তুগিজ, আর্মেনীয়, ইংরেজি ভাষার শিলালিপি নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করা হবে। আর কোম্পানি ও ব্রিটিশ আমলের শিলালিপি নিয়ে প্রকাশ করা হবে শিলালিপি বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থ। মুঘল আমলের শিলালিপির অধিকাংশের অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। গ্রন্থে প্রতিটি শিলালিপির আলোকচিত্র, বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকবে।

আমরা প্রতিবেদন এবং আলোকচিত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেই। প্রতিবেদন প্রকাশের কাজটি দ্রুত করতে গিয়ে ছোটখাটো ভুল থাকতে পারে। ঢাকার কয়েকটি অঞ্চল বিশেষত পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে এখনো জরিপ বাকী আছে। ঈদের পর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জরিপের বাকী ফলাফল ও অগ্রগতি জানাতে চেষ্টা করবো। জরিপসহ স্থাপত্য গ্রন্থিত করার কাজে অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সহায়তা করেছেন। তাদের নাম গ্রন্থে উল্লেখ করা হবে।

আমরা বিশ্বাস করি, ঢাকায় বিভিন্ন স্থাপত্যের আরো শিলালিপি রয়েছে। খোঁজ করা হলে আরো অগ্রন্থিত শিলালিপির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আমাদের ধারণা, শিলালিপি গ্রন্থিত হওয়ার বিষয়টি জরুরি। কারণ যত দেরিতে গ্রন্থিত হবে, হারিয়ে যাওয়া শিলালিপির সংখ্যা তত বাড়বে।

(পাভেল রহমান) চেয়ারম্যান	জয়ীতা রায় (আহ্বায়ক)	(জান্নাতুল ফেরদাউস) সদস্য সচিব

২০০৮ সালের জরিপে পাওয়া অগ্রন্থিত শিলালিপি (ফারসি ও আরবি)
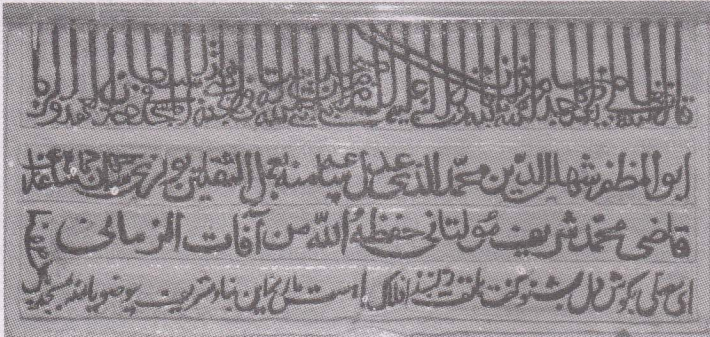
১
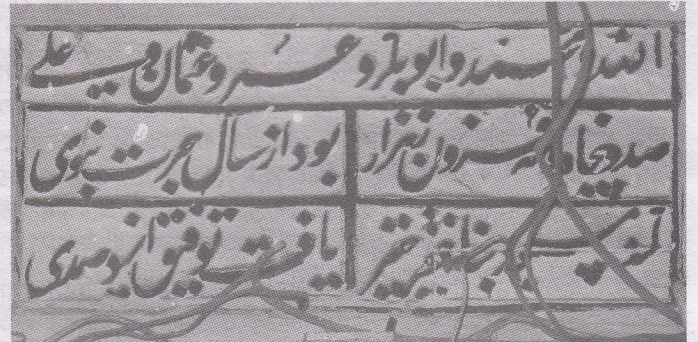
২
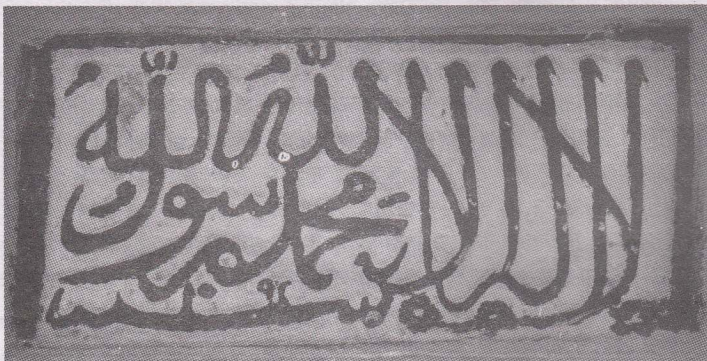
৩

৪

৫

৬

১. কাজী মোহাম্মদ শরীফ মসজিদ-১ (ফারসি), ১৬৪২-৪৩, আলোকচিত্র: নাসির আলী মামুন

২. কাজী মোহাম্মদ শরীফ মসজিদ-২ (ফারসি), ১৬৪৪, আলোকচিত্র: নাসির আলী মামুন

৩. বাড্ডানগর মুন্সী বাড়ির মসজিদ (ফারসি), ১৬৮১, আলোকচিত্র: কাকলী প্রধান

৪. বড় ভাট মসজিদ (ফারসি), ১৬৮৬, আলোকচিত্র: সৈয়দ জাকির হোসেন

৫. আমলীগোলা ছোট মসজিদ (ফারসি), ১৬৮২, আলোকচিত্র: শেখ হাসান

৬. নলগোলা শাহী মসজিদ (ফারসি), ১৬৮৯, আলোকচিত্র: নাসির আলী মামুন

২০০৮ সালের জরিপে পাওয়া অগ্রন্থিত শিলালিপি (ফারসি ও আরবি)
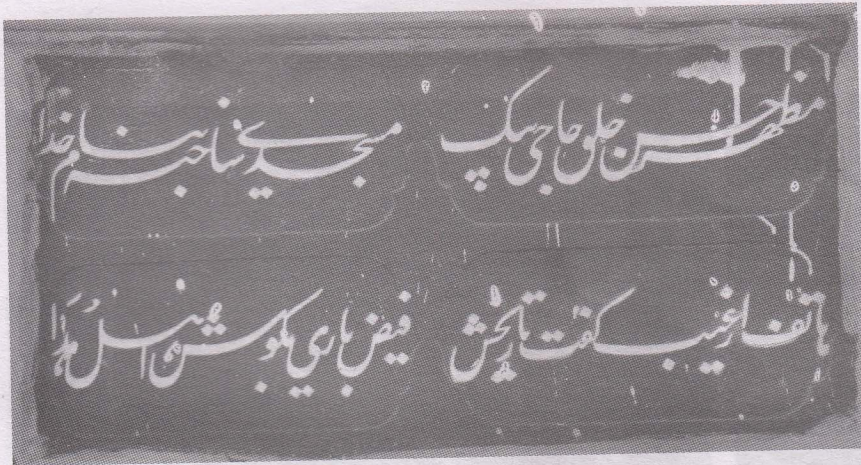
৭
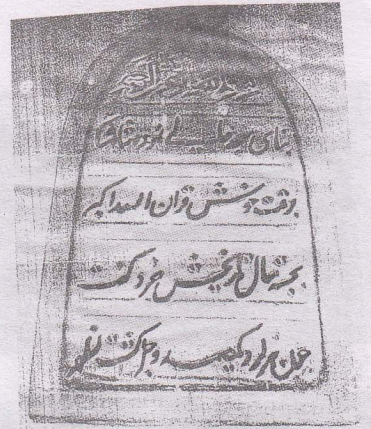
৮

৯
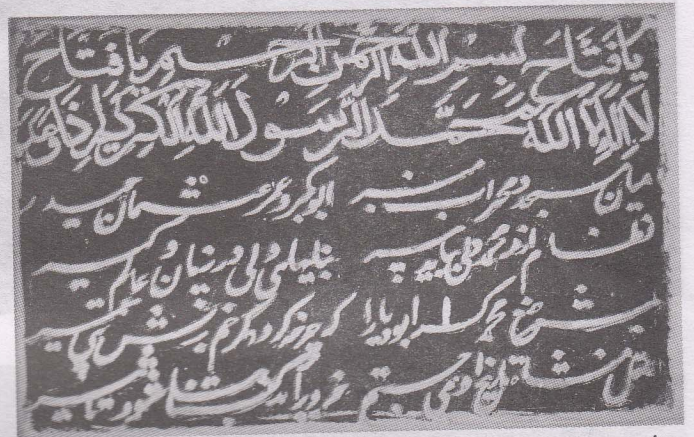
১০
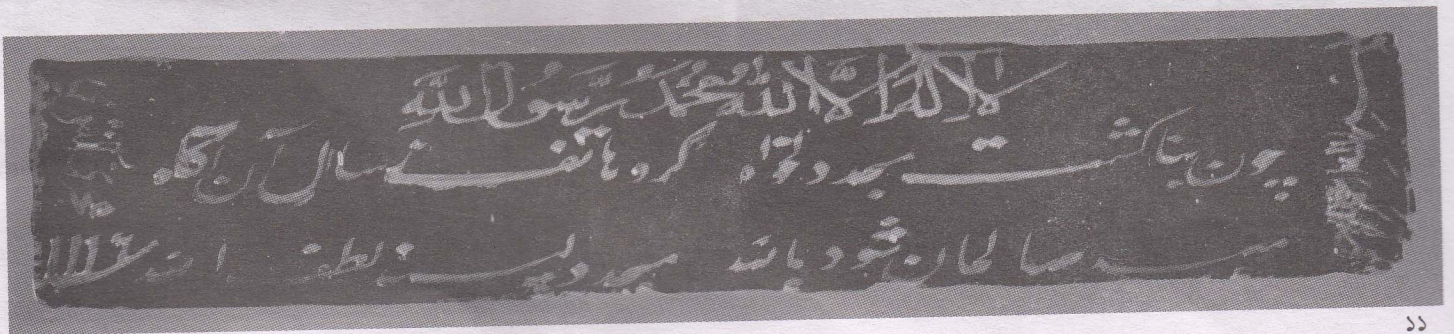
১১

৭. হাজী বেগ মসজিদ (ফারসি), ১৬৯১, আলোকচিত্রঃ শেখ হাসান

৮. শাহ নূরী মসজিদ (ফারসি), ১৬৯২, আলোকচিত্রঃ সৈয়দ জাকির হোসেন

৯. নিমতলী ছাতাওয়ালা মসজিদ (ফারসি), ১৬৯২, আলোকচিত্রঃ জিয়া ইসলাম

১০. রায় সাহেব বাজার পুলের মসজিদ (ফারসি), ১৬৯৯, আলোকচিত্রঃ পাভেল রহমান

১১. খাজে দেওয়ান লেন শাহী মসজিদ (ফারসি), ১৭০৪-০৫, আলোকচিত্রঃ কাকলী প্রধান

২০০৮ সালের জরিপে পাওয়া অগ্রন্থিত শিলালিপি (ফারসি ও আরবি)

১২
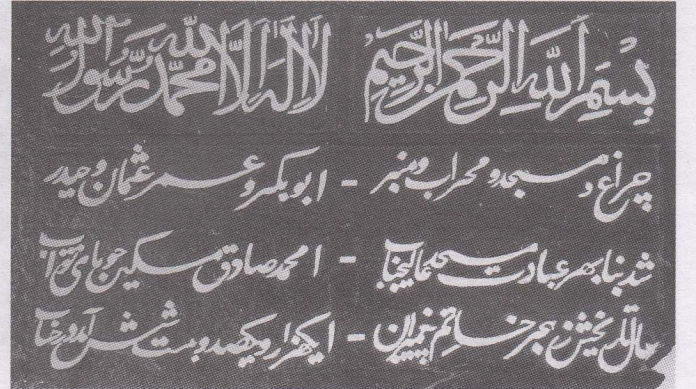
১৩

১৪

১৫

১৬

১৭
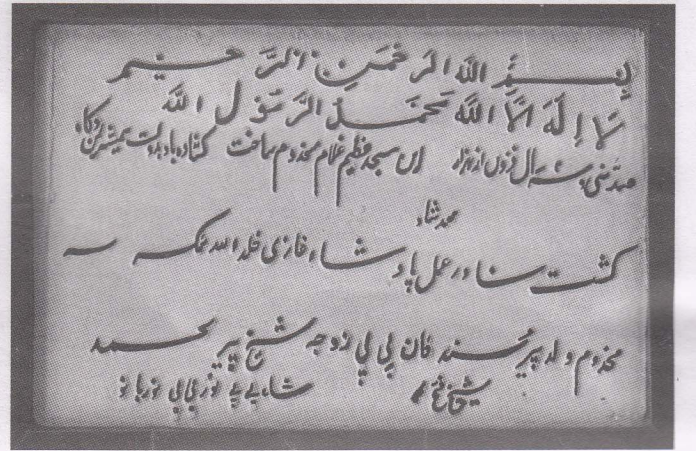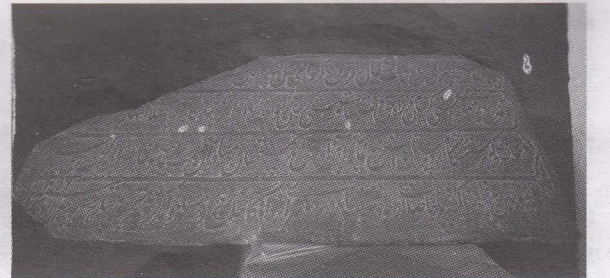
১২. বিবি মরিয়ম সালেহার মসজিদ (ফারসি), ১৭০৬, আলোকচিত্র: জিয়া ইসলাম
১৩. কেন্দ্রীয় কারাগার বাগানবাড়ি মসজিদ (ফারসি), .১৭১২, আলোকচিত্র: নাসির আলী মামুন
১৪. বড় কাটরা ছোট মসজিদ (ফারসি), ১৭১৩, আলোকচিত্র: কাকলী প্রধান
১৫. আগা সাদেক রোড মসজিদ (ফারসি), ১৭২০, আলোকচিত্র: সৈয়দ জাকির হোসেন
১৬. শাহী মসজিদ লক্ষীবাজার (ফারসি), ১৮১৬ (সংস্কার), আলোকচিত্র: জিয়া ইসলাম
১৭. আমলিগোলা বড় জামে মসজিদ (ফারসি), ১৬৮৭ আলোকচিত্র: পাভেল রহমান

২০০৮ সালের জরিপে পাওয়া অগ্রন্থিত শিলালিপি (ফারসি ও আরবি)

১৮
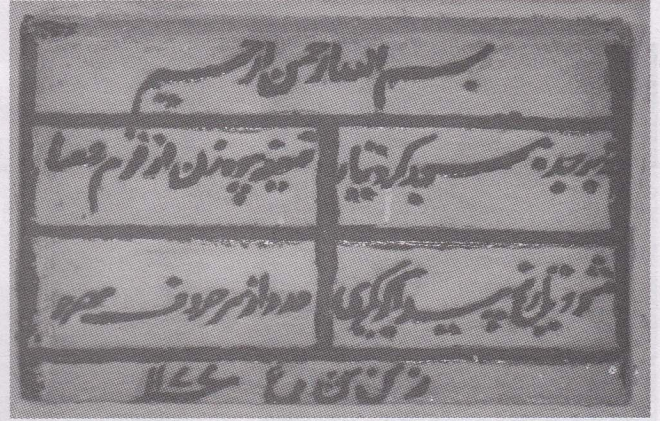
১৯
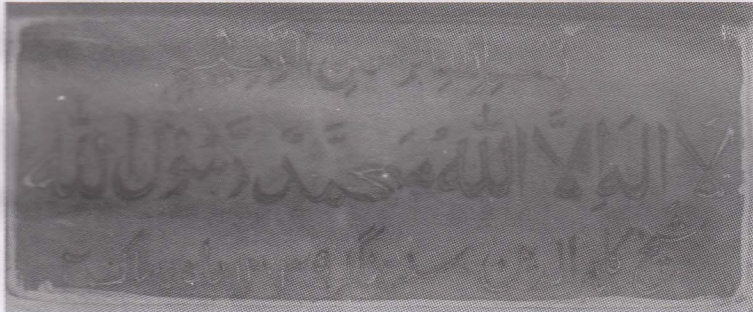
২০
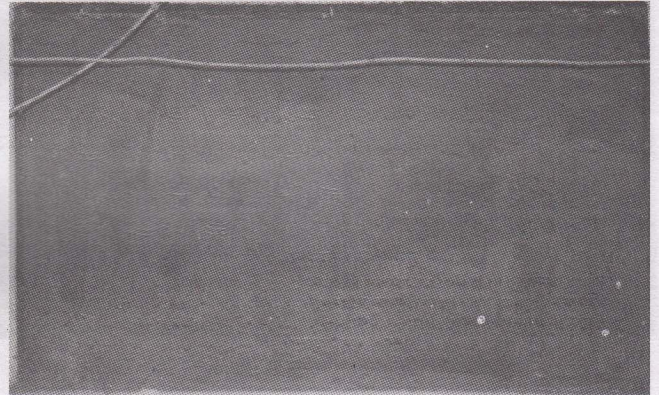
২১

১৮. ছোট ভাট মসজিদ (ফারসি), আলেকচিত্র: জিয়া ইসলাম

১৯. ভাটিখানা মসজিদ (ফারসি), আলেকচিত্র: শেখ হাসান

২০. বেগম বাজার মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থান (ফারসি), আলেকচিত্র: জিয়া ইসলাম

২১. জিন্দাবাহার কামরাঙ্গা মসজিদ (ফারসি), আলেকচিত্র: পাভেল রহমান

পর্তুগিজ, ল্যাটিন, আর্মেনীয় ও ইংরেজী ভাষার শিলালিপি (মুঘল আমল)
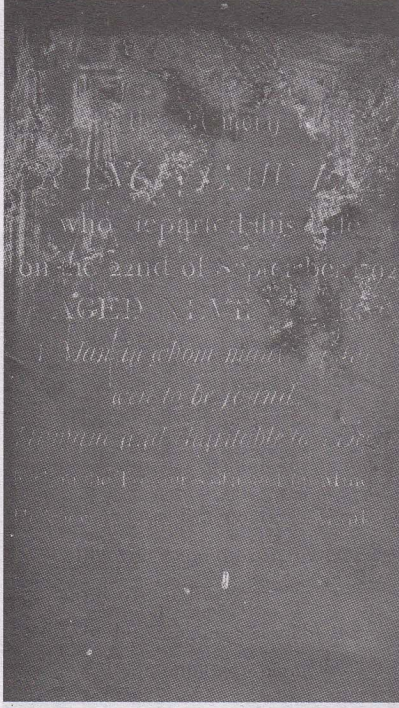
১

২

৩

৪

৫

১. খ্রিস্টান কবরস্থানের এপিটাফ (ইংরেজী-নারিন্দা) ১৭০২, আলোকচিত্রঃ পাভেল রহমান

২. জোজে আভিয়াটিসের এপিটাফ (আর্মেনীয় ও পর্তুগীজ-তেজগাঁ চার্চ) ১৭০৪, আলোকচিত্রঃ পাভেল রহমান

৩. খ্রিস্টান কবরস্থানের এপিটাফ (ইংরেজী-নারিন্দা) ১৭২৪, আলোকচিত্রঃ পাভেল রহমান

৪. সিমা ও সোয়ারেস এর এপিটাফ (পর্তুগীজ-তেজগাঁ চার্চ) ১৯২৫, আলোকচিত্রঃ পাভেল রহমান

৫. মিন্নাস আরমের এপিটাফ (আর্মেনীয় ও পর্তুগীজ-তেজগাঁ চার্চ) ১৭৩৯, আলোকচিত্রঃ পাভেল রহমান

পর্তুগিজ, ল্যাটিন, আর্মেনীয় ও ইংরেজী ভাষার শিলালিপি (মুঘল আমল)

৬

৭

৮

৯

৬. জোয়ানস ফিকের এপিটাফ (ল্যাটিন-তেজগাঁ চার্চ) ১৭৪৮, আলোকচিত্রঃ পাভেল রহমান

৭. মারিয়ানা লুক্রেশিয়া ফিকের এপিটাফ (ল্যাটিন-তেজগাঁ চার্চ) ১৭৪৮, আলোকচিত্রঃ পাভেল রহমান

৮. আর্মেনীয় ভাষার এপিটাফ, তেজগাঁ চার্চ, আলোকচিত্রঃ পাভেল রহমান

৯. আর্মেনীয় ভাষার এপিটাফ, তেজগাঁ চার্চ, আলোকচিত্রঃ পাভেল রহমান

২০০৯ সালের জরিপে পাওয়া অগ্রন্থিত শিলালিপি (ফারসি ও আরবি)

১

২

৩
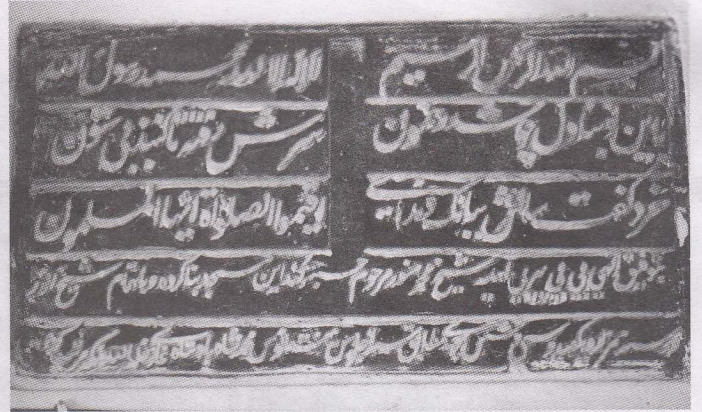
৪
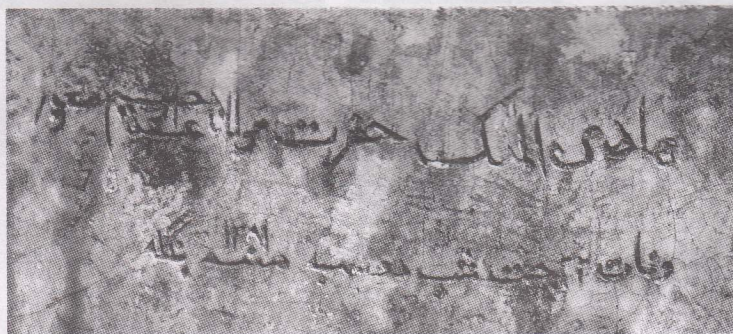
৫

১. আলমগঞ্জ মসজিদ (ফারসি ও আরবী), ১৭০৭, আলোকচিত্রঃ কাকলী প্রধান
২. গোর ই শহীদ মসজিদ (ফারসি), ১৭২২-২৩, আলোকচিত্রঃ পাভেল রহমান
৩. বায়তুল হুজ্জাত মসজিদ (ফারসি), ১৭৪৯, আলোকচিত্রঃ সংগৃহীত
৪. নবাবগঞ্জ মসজিদ (আরবি), ১৭৪৯, আলোকচিত্রঃ কাকলী প্রধান
৫. কাজী মাসউদ-এর মাজার (ফারসি), আলোকচিত্রঃ শেখ হাসান

২০০৯ সালের জরিপে পাওয়া অগ্রন্থিত শিলালিপি (ফারসি ও আরবি)
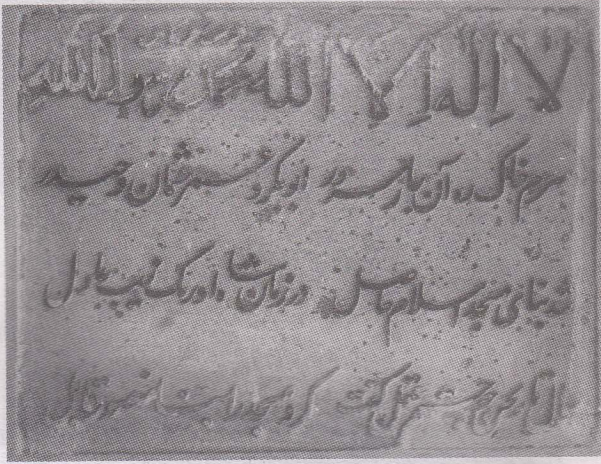
৬

৭
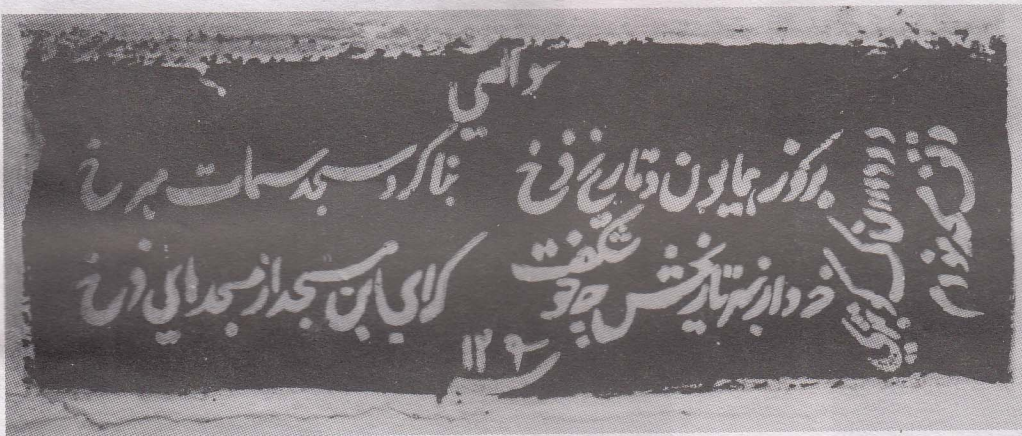
৮
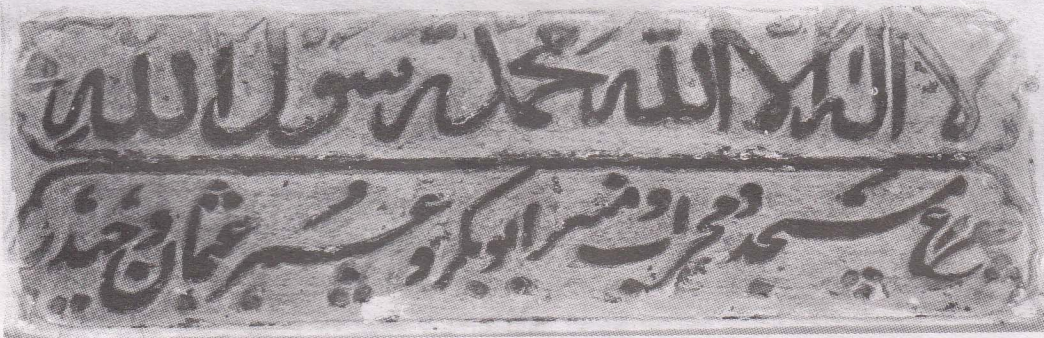
৯

৬. জিন্দাবাহার জামে মসজিদ (ফারসি), আলোকচিত্র: পাভেল রহমান
৭. পল্টন ময়দার মসজিদ (ফারসি), আলোকচিত্র:
৮. উমেশ দত্ত লেন মসজিদ (ফারসি), আলোকচিত্র: শেখ হাসান
৯. নূরানী জামে মসজিদ (ফারসি), আলোকচিত্র: কাকলি প্রধান

২০১০ সালের জরিপে পাওয়া অগ্রন্থিত শিলালিপি (ফারসি ও আরবি)

১
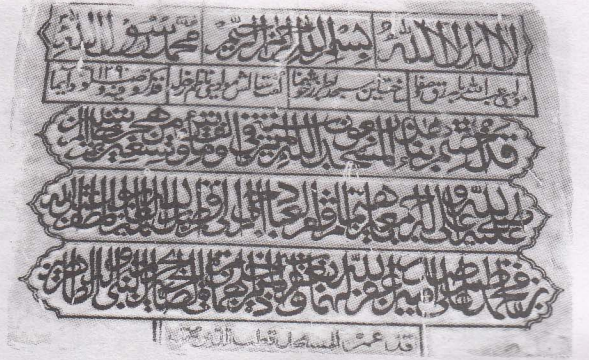
২

৩
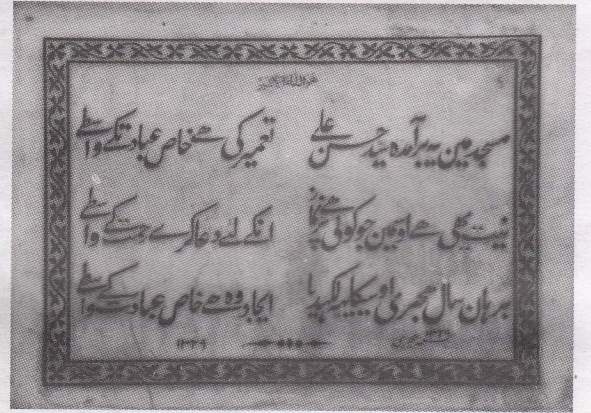
৪
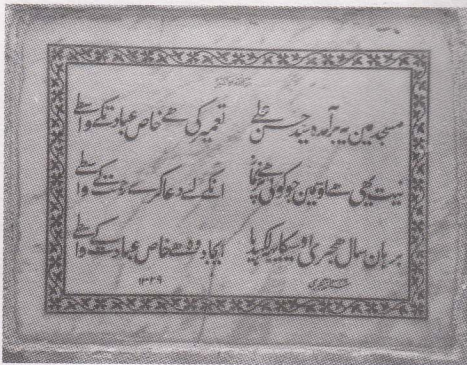
৫

৬

১. বাবুবাজার জামে মসজিদ, আলোকচিত্র: পাভেল রহমান
২. বেচারাম দেউড়ি মসজিদ, আলোকচিত্র: জয়ীতা রায়
৩. শাহ সৈয়দ কাশ্মিরির মাজার, আলোকচিত্র: জয়ীতা রায়
৪. আমির উদ্দিন দারোগা মসজিদ-১, আলোকচিত্র: ফিরোজ চৌধুরী
৫. আমির উদ্দিন দারোগা মসজিদ-২, আলোকচিত্র: ফিরোজ চৌধুরী
৬. গার্ড সাহেব এর মসজিদ, আলোকচিত্র: কাকলী প্রধান

২০১০ সালের জরিপে পাওয়া অগ্রন্থিত শিলালিপি (ফারসি ও আরবি)
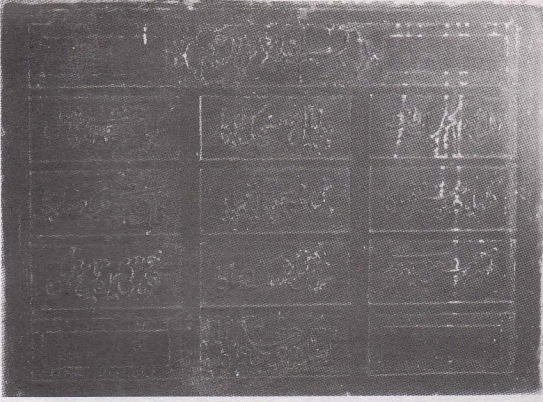
৭
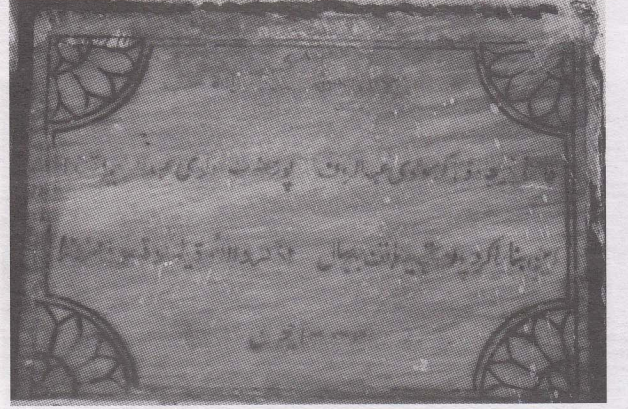
৮
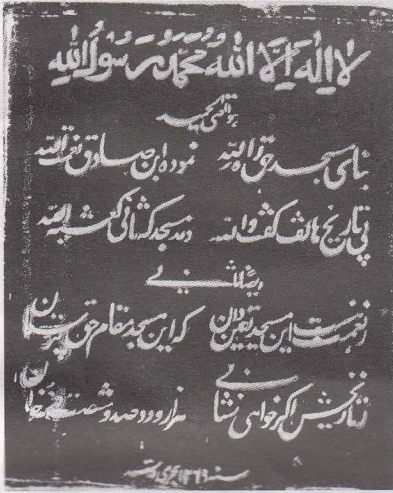
৯

১০
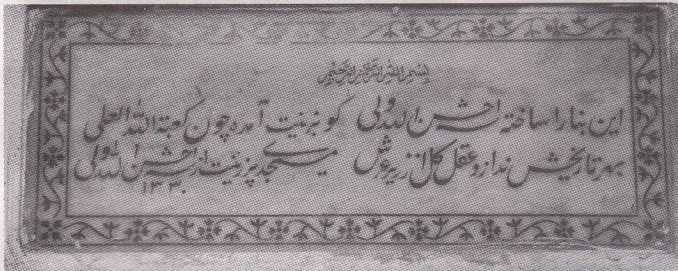
১১
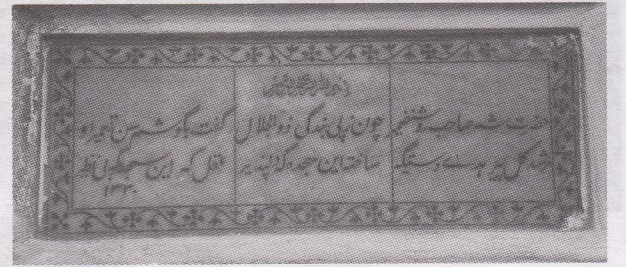
১২

৭. জম্মুখানম মসজিদ-১, আলোকচিত্রঃ পাভেল রহমান
৮. রুকনপুর কাজী বাড়ির মসজিদ, আলোকচিত্রঃ সৈয়দ জাকির হোসেন
৯. নাজিরা বাজার বড় জামে মসজিদ, আলোকচিত্রঃ জয়ীতা রায়
১০. লোহারপুর জামে মসজিদ, আলোকচিত্রঃ ফিরোজ চৌধুরী
১১. শাহ সাহেব বাড়ি মসজিদ-১, আলোকচিত্রঃ ফিরোজ চৌধুরী
১২. শাহ সাহেব বাড়ি মসজিদ-২, আলোকচিত্রঃ ফিরোজ চৌধুরী

২০১০ সালের জরিপে পাওয়া অগ্রন্থিত শিলালিপি (ফারসি ও আরবি)
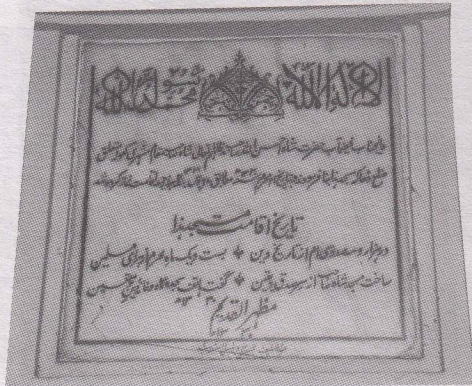
১৩
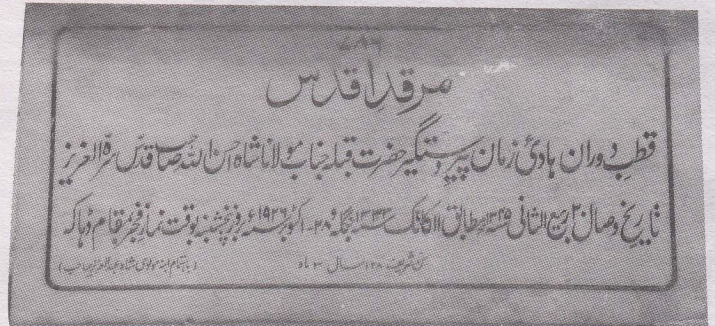
১৪

১৫
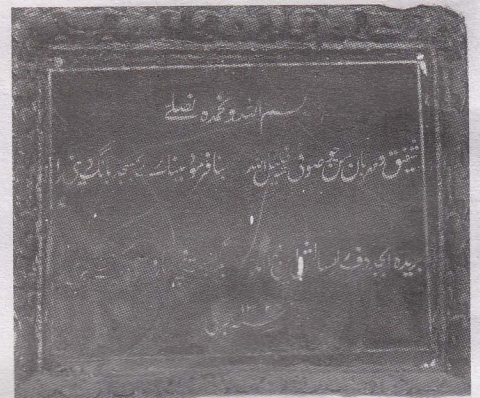
১৬
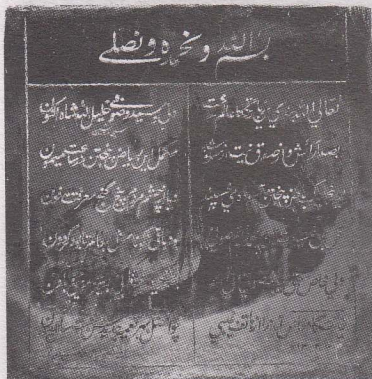
১৭
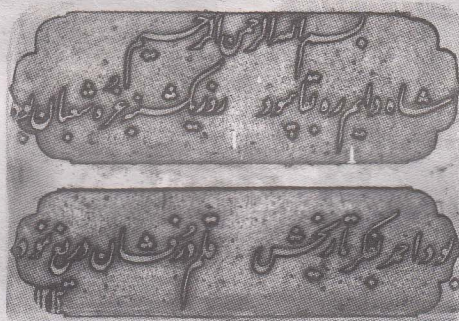
১৮

১৯

১৩. শাহ সাহেব বাড়ি মসজিদ-৩, আলোকচিত্রঃ ফিরোজ চৌধুরী
১৪. শাহ সাহেব বাড়ি মাজার, আলোকচিত্রঃ ফিরোজ চৌধুরী
১৫. আলী নকি দেউড়ি মসজিদ, আলোকচিত্রঃ ফিরোজ চৌধুরী
১৬. আজিমপুর বড় দায়েরা শরিফ মসজিদ, আলোকচিত্রঃ শেখ হাসান
১৭. আজিমপুর বড় দায়েরা শরিফ মাজার-১, আলোকচিত্রঃ শেখ হাসান
১৮. আজিমপুর বড় দায়েরা শরিফ মাজার-২, আলোকচিত্রঃ শেখ হাসান
১৯. আজিমপুর ছোট দায়েরা শরিফ মাজার, আলোকচিত্রঃ শেখ হাসান

২০১০ সালের জরিপে পাওয়া অগ্রন্থিত শিলালিপি (ফারসি ও আরবি)

২০

২১

২২
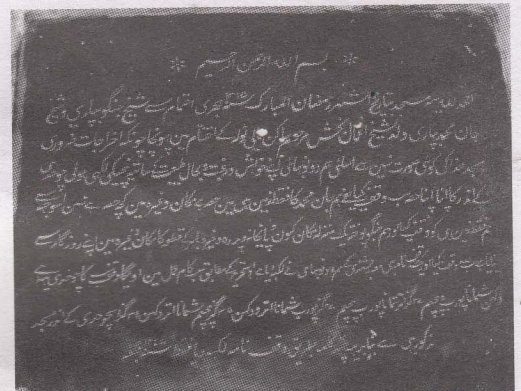
২৩

২৪

২০. নাজিম উদ্দিন রোড শাহী মসজিদ, আলোকচিত্র: শেখ হাসান
২১. ইব্রাহিম আদহামের মাজার, আলোকচিত্র: জিয়া ইসলাম
২২. মালিটোলা জামে মসজিদ, আলোকচিত্র: জিয়া ইসলাম
২৩. বাশপট্টি মসজিদ-১, আলোকচিত্র: পাভেল রহমান
২৪. বাশপট্টি মসজিদ-২, আলোকচিত্র: পাভেল রহমান